ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1199-1213
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.122

প্রাগাধুনিক বাংলা হস্তলিপি: ঐতিহ্যের শিল্পিত রূপান্তর ও ইতিহাসের নীরব ভাষ্য

ইয়াসমিন প্রামানিক, *রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাণ্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The ancient handwritten manuscripts of the Bengali language are not merely linguistic expressions but represent a profound cultural heritage. This paper explores the historical evolution, artistic attributes, and socio-cultural significance of pre-modern Bengali manuscripts. Starting from the palm-leaf and birch-bark manuscripts preserved in ancient universities like Takshashila and Nalanda to the flourishing manuscript culture of medieval Bengal, every stage reflects a silent artistic legacy. The study highlights the structural beauty of these handwritten texts, their intricate calligraphy, and the unparalleled craftsmanship of scribes. Additionally, it discusses the process of manuscript reproduction and its impact on society. These handwritten manuscripts not only preserved literary traditions but also acted as milestones in the development of Bengali literature. These valuable relics from the past are not merely objects of pride for our heritage; they symbolize the immortality of Bengali literary art. The findings of this research emphasize the responsibility of the present generation to preserve this legacy for future ones.

Keywords: Manuscript, Pre-modern Bengali, Palm-leaf Manuscripts, Calligraphy, Scribe, Literary Heritage, Manuscript Reproduction

লিপির ইতিহাস মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রমাণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভাষার সূচনা পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে হস্তলিপির মাধ্যমে শিল্পমণ্ডিত রূপে বিকশিত হয়। বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যেও হস্তলিপির ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীন পুথি, তালপাতা ও ভোজপাতায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ আজও ইতিহাসের নিরব সাক্ষ্য বহন করে। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের কাছে একদিকে জ্ঞানচর্চার নিদর্শন, অন্যদিকে শিল্পিত ক্যালিগ্রাফির অপূর্ব উদাহরণ। বাংলার পুথি- সংস্কৃতি, যা মূলত মৌখিক পরম্পরায় শুরু হলেও, পরবর্তীতে লিপিকরদের নিপুণ হাতে হস্তলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এ লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনার নিপুণ প্রকাশ। তাই, বাংলার হস্তলিপি কেবলমাত্র ভাষার বাহন নয়; এটি এক মহাকালের শিল্পিত সাক্ষ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে

- **হাতের লেখার ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক মূল্যবোধ:**

“হাতের লেখা খারাপ হলে ক্ষতি নেই, লেখার হাত ভাল হওয়াই আসল।”- এই প্রবচন সাহিত্যিক সৃষ্টির গভীরতম তত্ত্বের প্রতিফলন। সাহিত্যের মর্মস্পর্শী অনুভূতি, চিন্তার গভীরতা ও কাব্যময়তা হাতের লেখার শৈল্পিকতার ওপর নির্ভর করে না; বরং লেখার অন্তর্নিহিত ভাব ও সৃজনশীলতায় তার অমরত্ব নিহিত। বাংলাসাহিত্যের বহু মনীষীর

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, হাতের লেখা যতই অস্পষ্ট হোক, চিন্তার গভীরতা ও কাব্যময়তার সৌকর্য আজও পাঠককে মুগ্ধ করে।

- **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি:**

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তালপাতা ও ভোজপাতায় লেখা অগণিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। শিক্ষার্থীরা হস্তলিপি শিখত এবং তা অলংকৃত ক্যালিগ্রাফি ও সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কনে সমৃদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাং- এর বিবরণ অনুযায়ী, নালন্দার গ্রন্থাগারে তিনটি বিভাগ- Ratnasagara, Ratnadadhi এবং Ratnaranjak- ছিল, যেখানে দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও ধর্মীয় তত্ত্ব সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার দুই প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র ছিল বাগদাদের 'বৈতুল হিকমাহ' এবং কর্ডোভার গ্রন্থাগার। এখানে গ্রিক, পার্সিয়ান ও ভারতীয় পাণ্ডুলিপির অনুবাদ হতো। ইবনে সিনা, আল- ফারাবি ও ইবনে রুশদ- এর দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল ক্যালিগ্রাফি ও অলংকরণের নিদর্শন।

ইউরোপে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তলিপি ছিল জ্ঞানচর্চার মূল ভরকেন্দ্র। অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। শেকসপিয়রের নাটকগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি ছিল হাতে লেখা এবং অলংকৃত। প্রতিটি অক্ষর সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফিতে উৎকীর্ণ ছিল।

- **হস্তলিপি সংরক্ষণ পদ্ধতি:**

প্রাচ্যে তালপাতা ও ভোজপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হতো। তক্ষশীলা ও নালন্দার গ্রন্থাগারে বাঁশ ও কাঠের বাক্সে রক্ষিত এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল জলরোধী ও কীটনাশক প্রতিরোধী। পাশ্চাত্যে ভেলাম (vellum) ও পার্চমেন্ট (parchment) ব্যবহৃত হত, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী। মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পাণ্ডুলিপিগুলি লোহার খাঁচায় সংরক্ষিত থাকত।

- **হস্তলিপির শিল্পগুণ ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য:**

হস্তলিপি ছিল কেবলমাত্র লিখনের মাধ্যম নয়, তা ছিল এক বিশেষ শৈল্পিক ঐতিহ্য। নালন্দা, তক্ষশীলা, বাগদাদ, কর্ডোভা, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ- এই সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে হস্তলিপির অলংকরণ ও ক্যালিগ্রাফি কেবলমাত্র জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম ছিল না, তা ছিল এক শৈল্পিক নিদর্শন। আজও সেই পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

- **বাংলা পুথি লিখনের ঐতিহ্য: মৌলিকতা, নকলনির্মাণ ও পাঠ-প্রক্রিয়া:**

বাংলা পুথি-সাহিত্য আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের এক অপরিহার্য ও মূল্যবান অঙ্গ। এ এক বিস্মৃত অধ্যায়, যা কখনো মৌলিক সৃষ্টির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আবার কখনো অনুলিপি নির্মাণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় জটিল। তবে, প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, আমি নিজে বাংলা পুথির হস্তাক্ষর-বিচার বা হাতের লেখার বিশ্লেষণে কোনও বিশেষজ্ঞ নই। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যে কতখানি কার্যকরী, তা অস্বীকারের অবকাশ নেই। আমি কেবলমাত্র পুথিপাঠ ও পুথি দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার নিজস্ব উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। তবে এই বিশ্লেষণ যে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়, সে দাবি আমার নেই। এ শুধু এক আন্তরিক প্রচেষ্টা, যেখানে পুথির লেখনপ্রণালী, তার প্রতিলিপি নির্মাণ, এবং মৌলিক রচনার অনুসন্ধানকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস থাকবে।

- **পুথি লিখনের তিনটি পর্যায়: মৌলিকতা থেকে নকলের প্রসার:**

বাংলা পুথি লিখনের ইতিহাস গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করলে মূলত তিনটি পৃথক ধারা পরিলক্ষিত হয়।

মৌলিক রচনা বা প্রাথমিক সৃষ্টিকর্ম:

পুথি রচনার সূচনাতেই থাকে সেই মৌলিক প্রতিভা, যে কবি বা লেখক প্রথমবারের মতো একটি সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেন। এটি মূলধারা, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী প্রতিলিপির বিস্তার ঘটে। এই মৌলিক পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা হত; একটিমাত্র কপি, যার পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় মৌলিক এই

পুথিগুলি নানা কারণে হারিয়ে যায়, বা নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মূলত মৌখিক পরম্পরায় সংরক্ষিত ছিল এবং পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ হয়। মৌলিক পুথির সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যে পাণ্ডুলিপি হাতে পাই, তা মৌলিক নয়, বরং তার বহু পর্যায়ের অনুলিপি।

প্রাথমিক নকলনির্মাণ:

মৌলিক পুথি রচনার পর তার প্রতিলিপি তৈরি হতো- কখনও সরাসরি পাঠ করে শুনিয়ে, কখনওবা চোখে দেখে লিখে। এই অনুলিপি প্রক্রিয়া একাধিক ব্যক্তির হাতে সম্পন্ন হতো, এবং প্রত্যেকের হাতে লেখার ভঙ্গি, বানানরীতি ও ভাষার প্রয়োগে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা দিত। এখানেই নকলনির্মাণের সূচনা, যা মূল লেখার ভাবকে ধরে রাখলেও কোথাও কোথাও ভিন্নতা তৈরি করত। এই ভিন্নতা কখনও ছিল অনিচ্ছাকৃত- যেমন, লিখনপ্রক্রিয়ায় অনবধানতা বা ভুল, আবার কখনও সচেতনভাবে রচনার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রতিলিপিকার নিজস্ব ব্যাখ্যা বা ভাবনাও রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিভিন্ন পাঠান্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একই পঙক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রতিটি নকল পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান।

নকলের উপর নকল: চিরায়ত প্রতিলিপির বিস্তার:

প্রাথমিক নকলনির্মাণের পর, সেই নকল থেকে আবার আরও নকল তৈরি করা হতো। এ প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায়শই ছিল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতামুক্ত। ফলে, একটি পুথির অসংখ্য সংস্করণ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। এখানে মৌলিক রচনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হত; পাঠের ক্রমাগত প্রচার ও পুনরুৎপাদনের ফলে মৌলিক বক্তব্যে সংযোজন-বিয়োজন ঘটত। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলায় এই প্রতিলিপি নির্মাণের প্রবণতা অব্যাহত ছিল, যা শুধু কাব্য নয়, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিস্তৃত ছিল।

- **প্রতিলিপি নির্মাণে পরিবর্তনের ধারা ও তার প্রভাব**

একটি মৌলিক রচনার প্রতিলিপি তৈরি করতে গেলে কেবল লেখকের ভাষা ও বক্তব্য সংরক্ষিত থাকত না; প্রতিলিপিকার নিজস্ব বোধ, ব্যাখ্যা ও মনোভঙ্গিও সংযোজিত হত। এ এক অভিনব প্রক্রিয়া, যেখানে মূল রচনাটি ক্রমান্বয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করত। অনেক সময় মূল লেখকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা ভাবগত সূক্ষ্মতা হারিয়ে যেত এবং তার পরিবর্তে নকলকারীর ভাষা ও শৈলীর প্রতিফলন ঘটত। এই পরিবর্তনকে 'পাঠান্তর বৈচিত্র্য' বলা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পাণ্ডুলিপি সংস্কৃতির উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশেষত মধ্যযুগের ইউরোপীয় কপিস্টরা (Scribes) যখন বাইবেল বা ক্লাসিক গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি করতেন, তখন তাঁদের হাতের লেখায় বা ব্যাখ্যায় নানান ভিন্নতা দেখা দিত। এটি কখনও বানানরীতি, কখনও বাক্যগঠন, কখনওবা শব্দার্থে পরিবর্তন আনে। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মতে, এটি শুধু ভাষার বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করেনি; বরং একটি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরি করেছে।

- **বাংলার পুথি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও তার সৃজনশীল বহমানতা**

বাংলা পুথি সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান স্মারক। মৌলিক রচনা থেকে প্রতিলিপি এবং তার পুনরুৎপাদনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পাঠান্তর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেনি, বরং বাঙালি জাতিসত্তার সাহিত্যচর্চার এক ঐতিহাসিক পরিচায়ক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিলিপি প্রথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একটি গ্রন্থ কেবলমাত্র লেখকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা কালক্রমে একাধিক অনুলিপিকারীর হাতে প্রসারিত হয় এবং ভাষার নতুন আঙ্গিকে বেঁচে থাকে।

- **ভ্রমণকাব্যের আদিপর্ব: বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল':**

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনগুলির মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বিজয়রাম সেনের লেখা **'তীর্থমঙ্গল'**। এটি বাংলায় রচিত প্রথম সার্থক ভ্রমণকাব্যরূপে সাহিত্য-ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। এই অমূল্য গ্রন্থটি সংরক্ষিত আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ, যেখানে বাংলা সাহিত্যের বহু অমূল্য ধ্রুপদী নিদর্শন যুগযুগান্তর ধরে লালিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। 'তীর্থমঙ্গল'-এর বিশেষত্ব এই যে, এটি বিজয়রাম সেনের স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত এক ঐতিহাসিক দলিল, যা রচিত হয়েছিল ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। এমন সরল অথচ সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে রচিত এই পুথিটি বাংলা পাণ্ডুলিপি সাহিত্যকে নতুন দিগন্তে উন্নীত করেছে।

- **হস্তলিপির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য:**

বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'- এর এক বিশেষ তাৎপর্য হল, এতে ব্যবহৃত হস্তলিপির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ শব্দই তিনি পৃথকভাবে লিখেছেন; অর্থাৎ, শব্দগুলি একে অপরের সংলগ্ন হয়ে মিশে যায়নি। বাংলার প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের পুথিগুলিতে সাধারণত একটানে পদ বা বাক্য লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পাণ্ডুলিপি- সংস্কৃতিতে এটি 'টানা লেখা' নামে পরিচিত, যেখানে কাগজ থেকে কলম না- তুলে এক প্রবাহে পুরো বাক্য বা পদ লেখা হত। এই একটানা লেখাকে সে-সময়ে একধরনের 'পুণ্যকর্ম' বলে গণ্য করা হত, কারণ এতে লেখার মাঝে ভাঙন ঘটত না, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকত।

তবে, বিজয়রাম সেন এই প্রথা ভেঙেছেন। তাঁর 'তীর্থমঙ্গল'- এ পৃথকভাবে লেখা শব্দগুলির পরিচ্ছন্ন বিন্যাস কেবল হস্তলিপির সুসংহত রূপই উপস্থাপন করেনি, এটি পাঠকের পাঠ- স্বাচ্ছন্দ্যেও অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। পুথি পাঠের ক্ষেত্রে এক একটি শব্দ আলাদা ভাবে প্রতিস্থাপিত থাকায় পাঠক সহজেই তার ভাবসম্প্রসারণে প্রবেশ করতে পারে।

ভ্রমণকাব্যের অগ্রদূত:

'তীর্থমঙ্গল'-কে বাংলাভাষার প্রথম সার্থক ভ্রমণকাব্য বলা হয়। ভ্রমণকাহিনির সাহিত্যমূল্য যেখানে শুধুমাত্র ভৌগোলিক বর্ণনা নয়, বরং সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিক, মানুষের জীবনধারা, বিশ্বাস, আচার- অনুষ্ঠানের চিত্রায়ণ- এই সবই বিজয়রাম সেন দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এক অর্থে এটি কেবল ভ্রমণের বিবরণ নয়, বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আঙ্গিনার এক জীবন্ত দলিল।

প্রসঙ্গান্তরে: ভ্রমণকাব্যের প্রসার ও ধারা:

বাংলা ভ্রমণকাব্যের অগ্রদূত হিসেবে 'তীর্থমঙ্গল'যে নতুন ধারার সূচনা করেছিল, তার প্রভাব পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিকদের লেখায় পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', এবং মধুসূদন দত্তের 'কাপটিক কমল'- সবই ভ্রমণকাহিনির বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে হোমারের 'ওডিসি' বা ড্যান্টের 'ডিভাইন কমেডি' যেমন ভ্রমণকাহিনির মহাকাব্যিক রূপ, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণকাব্যেও বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' এক ঐতিহাসিক স্তম্ভ।

'তীর্থমঙ্গল' কেবল একটি ভ্রমণকাব্য নয়; এটি বাংলা সাহিত্যের আদি ভ্রমণকাহিনির এক মহিমামণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। এর হস্তলিপির ব্যতিক্রমী শৈলী, ভ্রমণের সরল অথচ বিশদ বর্ণনা এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উপলব্ধির নিবিড় প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যকে ঐতিহাসিক পরম্পরায় সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এর সংগ্রহে থাকা এই অমূল্য পুথিটি শুধু একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস।

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি:

'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? তবু জানিও, পথেই রহিয়াছে মুক্তি।'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পঙক্তি বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'- এর মূল দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ভ্রমণের পথে পথিক যেমন মুক্তির সন্ধান পায়, তেমনই বিজয়রাম সেন তাঁর তীর্থযাত্রার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন।

- **পুথির লিপি: নকলনবিশের পরম্পরা ও পাঠবিকৃতির আখ্যান:**

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথি- সাহিত্যের ধারায় তীর্থমঙ্গল ছাড়াও আরও বহু প্রাচীন বাংলা পুথির অস্তিত্ব আমাদের জানা আছে। কিন্তু খোঁজ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলির নাগাল পাওয়া যায়, সেগুলি মূল পাণ্ডুলিপি নয়, বরং তার অসংখ্য নকল বা প্রতিলিপি। এই নকল পাণ্ডুলিপিগুলিই যুগ যুগ ধরে লিপিকরদের দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় পুনর্লিখিত হয়ে এসেছে। তবে সমস্যা হলো, এই নকলনবিশের প্রক্রিয়ায় কেবল কপি বা হুবহু অনুলিপিই হয়নি; সময়ের প্রবাহে বহু ক্ষেত্রে শব্দের গঠন, বানান এমনকি বাক্যবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিভেদে নয়, স্থান-কাল-পাত্রভেদেও চিহ্নিত হয়েছে। শব্দের ছাঁচ বদলানোর বিষয়টি অবশ্য কালের সঙ্গে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন বলে ধরা যায়। ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ধ্বনিগত ও গঠনগত বিবর্তন', যা যুগের

পর যুগে ভাষার আপন স্বভাবেই ঘটে। তবে এই আলোচনা ভাষার প্রাকৃতিক বিবর্তন নয়, বরং মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপির ক্ষেত্রে যে বিকৃতি বা পরিবর্তন দেখা যায়, তা নিয়ে।

প্রাচীনকালে যাঁরা পুথি নকল করার পেশায় যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বলা হতো **লিপিকর**। এঁদের কাজ ছিল মূল পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করা। অর্থাৎ, একরকম পেশাদার নকলনবিশ বলা চলে। বিনিময়ে তাঁরা পেতেন ধান, বস্ত্র কিংবা অর্থ। এক্ষেত্রে পুথিলিখনের প্রতিযোগিতায় দক্ষ লিপিকরদের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার, ছন্দময় এবং টানা টানা অক্ষরে সুসজ্জিত। তাঁদের লেখা যেন একধরনের শিল্পমাধুর্য ধারণ করত। অথচ, পেশাদারিত্বের এই দিকটি সবসময় বজায় থাকত না। ড. কল্পনা হালদার তাঁর গবেষণায় লিপিকরদের তিনটি ভাগে বিভাজিত করেছেন- **শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত**।

এই শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষিত লিপিকরদের লেখায় ভাষার শুদ্ধতা ও সৌকর্য বজায় থাকত। তাঁদের হস্তলিপি ছিল সহজপাঠ্য, গঠনগত দিক থেকে যথার্থ এবং বানানবিধির প্রতি যত্নশীল। বিপরীতে, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লিপিকররা মূলত জীবিকার তাগিদে এই পেশায় যুক্ত হলেও তাঁদের লেখায় সেই পরিমিতি ও নিখুঁততা থাকত না। ফলে, তাঁদের হাতের লেখা অস্পষ্ট এবং অনেকক্ষেত্রে অসংলগ্ন হতো। পাঠবিকৃতি, বানানের অমিল, শব্দের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি—এসব ত্রুটি প্রায়শই দেখা যেত তাঁদের লেখনীতে। ড. হালদারের ভাষায়, 'নিছক জীবিকার প্রয়োজনে এই পেশায় আসা লিপিকরদের হাতের লেখায় ছিল না সুস্পষ্টতা; ছিল না যথার্থ পাঠযোগ্যতার নিশ্চয়তা।'

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'স্ক্রাইব' বা নকলনবিশদের কথা। সেখানেও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ক্রাইবদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যেত। যেমন, ফ্রান্সিস বেকন মন্তব্য করেছিলেন, 'Copyists are not mere scribblers; they are the guardians of words, yet often the betrayers of authenticity.' অর্থাৎ, নকলনবিশরা কেবল লেখক নন, তাঁরা শব্দের রক্ষকও বটে, কিন্তু সেই রক্ষণের মধ্যেই অনেকসময় মূল রচনার বিশুদ্ধতা ব্যাহত হয়। বাংলা পুথির ক্ষেত্রেও এই কথাটি খাটে।

প্রাচীন যুগে বানানবিধি ছিল একরকম অদৃশ্য ধারণা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনও বানানরীতি ছিল না; তাই লিপিকররা প্রায়শই নিজেদের মতো বানান লিখে রাখতেন। এমনকি একই পুথির বিভিন্ন স্থানে একই শব্দের একাধিক বানানও দেখা যেত। এই বানানবিধির বৈচিত্র্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধারণার উপর নির্ভর করত না, অঞ্চলভেদেও পরিবর্তিত হতো। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বলা যায়, যেমন মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যে *Canterbury Tales* এর পাণ্ডুলিপিতেও বানানের এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। চসারের ভাষায়, "And eek therto he was right curious; His writinge ful craftily was dight,"- এই পংক্তিতে 'writinge' শব্দের বানান বর্তমান ইংরেজি 'writin' থেকে ভিন্ন হলেও তখন সেটি স্বাভাবিক ছিল।

আসলে, বাংলা পুথি-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে লিপিকরদের এই বানান- বিভ্রাটকে সম্পূর্ণ ভুল বলা চলে না। কারণ, তখনকার পাঠক মূলত শ্রোতা ছিলেন। পুথি পাঠের প্রথা ছিল মূলত শ্রুতিনির্ভর। শ্রোতার কানে বানানভুল ধরা পড়ত না; তাঁদের কাছে ভাষার ধ্বনিগত সৌন্দর্যই মুখ্য ছিল। তাই, লিপিকররা বহুক্ষেত্রে বানান ভুলের পরোয়া না করেই লেখনী শেষ করতেন। এটি ভাষার ধ্বনিগত প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্যই ছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য স্মরণযোগ্য:'Writing is the painting of the voice.' অর্থাৎ, লেখনী হচ্ছে কণ্ঠস্বরের চিত্রায়ণ। সেই চিত্রায়ণে যদি ধ্বনির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বানানের অসংগতি সেভাবে অনুভূত হয় না। বাংলা পুথি-সংস্কৃতিতেও লিপিকরদের এই প্রবণতা একইভাবে লক্ষণীয়।

সর্বোপরি, বাংলা পুথি-সংস্কৃতির ধারায় লিপিকরদের অবদান অস্বীকার করার নয়। তাঁদের হাত ধরেই পুথিগুলি প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও তাদের লেখনীর অসংগতিগুলি আধুনিক গবেষকের জন্য একপ্রকার 'পাঠবিকৃতি' রূপে দেখা দেয়, তবু সেই বিকৃতিই ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থেকে যায়। তাই, পুথি-সংস্কৃতির এই নকলনবিশ পরম্পরাকে মূল্যায়ন করতে হলে শুধুমাত্র বানান ও ভাষার বিশুদ্ধতার নিরিখে বিচার করলে চলবে না; প্রয়োজন ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা।

- **পুথি-লিপির শৈল্পিক পরম্পরা: হস্তাক্ষরের নিপুণতা ও বৈচিত্র্য:**

হস্তাক্ষরের অনুশীলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুথি- লিপির ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের এক গভীর শৈল্পিক অধ্যায়। একাধারে এটি বর্ণমালার শিল্পিত প্রকাশ, অন্যদিকে ইতিহাসের অমোঘ সারণি। লিপিকরদের হাতের লেখা কেবল পাঠযোগ্যতার জন্য নয়; বরং তা একপ্রকার শিল্পের সংরক্ষণ। লিপিকরের হাতের ভঙ্গি, অক্ষরের বিন্যাস, টানের সূক্ষ্মতা ও পঙক্তির সাযুজ্য মিলিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি পুথি। হস্তাক্ষরের সুঠামতা, পরিশীলিত রূপ এবং গভীর শৈল্পিকতাই প্রকাশ করে সেই লিপিকরের অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতা।

- **পরিশীলিত লিপির নিদর্শন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মনসামঙ্গল:**

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ সংরক্ষিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*- এর পুথিটি হস্তাক্ষরের শৈল্পিকতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এর প্রতিটি অক্ষরে সুসংবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার ছাপ স্পষ্ট। যদিও লিপিকরের নাম জানা যায়নি, তবে তার হাতের লেখা দেখে অনুমান করা যায় যে তিনি একজন দক্ষ লিপিকর ছিলেন। এরূপ বহু পুথি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে রয়েছে, যেখানে লিপিকরের নাম ও নকলের তারিখ পুষ্পিকায় উল্লেখ থাকে। এই পুষ্পিকাগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থের আদি বা অন্তে স্থান পায় না; বরং তা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকে, যা গবেষকদের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংরক্ষিত বিপ্রদাস পিপিলাই- এর *মনসামঙ্গল*-এর পুথি (লিপিকর: জয়দেব নন্দী, ১২৩১ বঙ্গাব্দ) সেই একই শৈল্পিকতার স্বাক্ষর বহন করে। জয়দেব নন্দীর হাতের লেখায় যে নিখুঁত সুবিন্যস্ততা, অক্ষরের মসৃণ গঠন এবং অনুপম শৈলী দেখা যায়, তা প্রমাণ করে তিনি কেবল পেশাদার লিপিকরই ছিলেন না, একজন শিল্পীও ছিলেন। তার লেখনীতে প্রতিটি অক্ষর যেন শিল্পের একেকটি নিদর্শন।

- **অপেশাদারিত্বের প্রতিচ্ছবি: দ্রুত হাতের লেখার প্রকাশ:**

এর বিপরীতে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত বিপ্রদাস পিপিলাই- এর আরেকটি *মনসামঙ্গল* পুথি, যা লিপিকর গোপীনাথ সিংহের হাতে লেখা, তা লিপিকরের অপেশাদারিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তার অক্ষরের বিন্যাস, পঙক্তির অমিল ও ওপর- নীচের ব্যবধানহীনতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি তিনি কোনো মূল পুথির উপর নির্ভর না করে শুনে শুনেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এখানে পেশাদারিত্বের অভাব স্পষ্ট; লেখার গঠনশৈলীতে একপ্রকার অগোছালো ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বভারতীতে রক্ষিত মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* (লিপিকর: বেচারাম সম্মণ, ১১৯৪ বঙ্গাব্দ) এবং দ্বিজ রঘুনন্দনের *পঞ্চাননমঙ্গল* (লিপিকর: রামকান্ত পণ্ডিত, ১২০২ বঙ্গাব্দ)-এর ক্ষেত্রেও এই অপেশাদারিত্ব ধরা পড়ে।

- **লিপির সূক্ষ্মতার শিল্পময়তা ও অপূর্ণতার বিপরীতমুখী রূপ:**

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, লিপিকরের দক্ষতা কেবল লেখার গঠনেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আসলে এক ধরনের শিল্পচেতনার প্রকাশ। মধ্যযুগীয় ইউরোপে *Illuminated Manuscripts* বা অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি যেমন লিপিকরের শিল্পীসত্তার উদাহরণ, তেমনি বাংলার পুথি-লিপিও এক ধরনের শৈল্পিক অভিজ্ঞান। ইউরোপীয় স্ক্রাইবরা প্রতিটি অক্ষরকে অলঙ্কৃত করতেন স্বর্ণ-রূপার আভায়, আর বাংলার লিপিকররা অক্ষরের গাঁথুনিতে রচনা করতেন শিল্পের ব্যঞ্জনা।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নিত্যানন্দ ঘোষের *মহাভারত* পুথিটি (১১৯৯ বঙ্গাব্দ), যা হস্তাক্ষরের অপূর্ণতার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, সেই তুলনামূলক বিশ্লেষণকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই পুথির লিপিকর পরিচিত নন; কেবল উল্লেখ আছে, 'এ পুস্তক শ্রীনিমাইচরণ মল্লিকের', এবং এটি মালিকের স্বহস্তলিখিত। অক্ষরের আকারের অসামঞ্জস্য, পঙক্তির অগোছালো বিন্যাস প্রমাণ করে এটি একজন অপ্রশিক্ষিত লিপিকরের হাতে লেখা।

- **লিপিকরের শৈল্পিকতার মূল্যায়ন ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান:**

বস্তুত, পুথির হস্তাক্ষর দেখে লিপিকরের দক্ষতা, তার শিল্পচেতনা এবং পাণ্ডুলিপি সৃষ্টির প্রতি তার আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি শুধু লেখার বাহক নয়, তা এক একটি ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ রক্ষিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বিশ্বভারতীর *মনসামঙ্গল* অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির *চৈতন্যমঙ্গল*— প্রত্যেকটি লিপিকরের দক্ষতা, শিল্পীসত্তা এবং মননশীলতার এক অনন্য উদাহরণ।

লিপির শৈল্পিকতা, তার সূক্ষ্মতা ও বিন্যাসের নিপুণতা আসলে এক ধরণের ঐতিহ্যের ধারক। কেবল পাঠ্যবস্তু নয়, পুথির প্রতিটি অক্ষরে স্পন্দিত হয় ইতিহাসের ধ্বনি, সংস্কৃতির আর্তনাদ এবং লিপিকরের আত্মনিবেদন। তাই পুথি- লিপি কেবল একটি লিপিবদ্ধ নথি নয়, তা হয়ে ওঠে এক অন্তর্গত শিল্পের বহিঃপ্রকাশ।

এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুথি-লিপিগুলি একদিকে পাঠযোগ্যতার ধারক, অন্যদিকে শৈল্পিকতার নিদর্শন। লিপিকরের হাতের লেখায় লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের সাক্ষ্য, শিল্পের প্রমাণ এবং লিপির প্রতি তার গভীর ভালোবাসার স্পর্শ।

- **শিবায়ন পুথি: ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে ফেরা স্মৃতি:**

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার মাটির বুক থেকে একদিন আলোর মুখ দেখেছিল একটি পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশ- **শিবায়ন পুথি**। সেই প্রাচীন লেখনীর স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে থাকা এই পুথিটির রচনাকাল অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিক সময়। যদিও এর পুষ্পিকা (কলophon) অনুপস্থিত, তবু সেই অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের গাত্রে বিধৃত রেখাগুলি যেন যুগ- যুগান্তরের নিঃশব্দ ইতিহাসকে ভাস্বর করে তোলে। লিপিকর বা লেখকের নাম অজ্ঞাত, কিন্তু সেই অক্ষরবিন্যাসের শৈল্পিক ধারাপ্রবাহ তাঁর ধৈর্য, একাগ্রতা ও অন্তর্নিহিত মননশীলতার নিদর্শন স্বরূপ। লিপিকরের পরিচয় অজ্ঞাত হলেও, তাঁর কলমের প্রতিটি আঁচড় যেন সময়কে থমকে দাঁড় করায়, পাঠককে নিয়ে যায় একটি হারিয়ে যাওয়া যুগের অন্তরালে।

লিপিকর মাত্রই কি তবে একজন প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুলিপি- লেখক? ইতিহাসের পরতে পরতে দেখা যায়, শুধু পেশাদার লিপিকর নয়, অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মানুষ নিজেও নকল করে রাখতেন ধর্মীয় শ্লোক বা তন্ত্রমন্ত্র। এই ব্যক্তিগত লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে হস্তাক্ষরের শৈলী কখনও অপরিণত, কখনও বা পরিশীলিত হয়ে উঠত। যেমন, তুলট কাগজের পাতায় লাল কালির উজ্জ্বলতায় লিপিবদ্ধ এক বিষঝাড়ার মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল এক শিশুসুলভ সরলতা। সেখানে হস্তাক্ষরের রেখাগুলি ছিল অসংলগ্ন, যেন শিক্ষানবিশের প্রথম হাতেখড়ি। এমন কাঁচা হাতের লেখাও কি তখনকার সমাজের একটি নিদর্শন নয়? সেই সময়ের মানুষের জীবন, শিক্ষার অবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ছবি কি এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যযুগের ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপি- সংস্কৃতির কথা। চার্চের ভেতর ধর্মীয় গ্রন্থ নকল করতেন একদল সন্ন্যাসী, যাঁদের বলা হতো *Scribes*। তাঁরা অবিচল ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একেকটি অক্ষরকে রূপ দিতেন, যেন প্রতিটি শব্দই ছিল একটি শিল্পকর্ম। আমাদের চন্দ্রকোণার শিবায়ন পুথির হস্তাক্ষরের শৈল্পিকতার মধ্যে যেন সেই মধ্যযুগীয় *Scribal Tradition*- এর প্রতিফলন দেখা যায়।

তবে, এর একটি ব্যতিক্রমী দিকও রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরেও তখনকার সমাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মানুষ অনেক তথ্য ও তন্ত্রমন্ত্র লিখে রাখতেন। বিষঝাড়ার মন্ত্রের সেই অসংলগ্ন হাতের লেখার মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর আস্থা। এটি কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন নয়; বরং লোকজীবনের অন্ধবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানেরও স্মারকচিহ্ন। এই বিষঝাড়ার মন্ত্র যেন সেই লোকাচারের এক নীরব দলিল, যেখানে হাতের লেখা হয়ে ওঠে জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি।

শিবায়ন পুথির লিপিকর অজ্ঞাত থাকলেও, তাঁর হাতের লেখায় ফুটে ওঠা ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাংলা সাহিত্যের সেই সব নিঃশব্দ স্রষ্টাদের কথা, যারা হয়তো নিজের নাম অক্ষরে অক্ষরে রেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিকর্ম আজও বেঁচে আছে সময়ের হাত ধরে। চন্দ্রকোণার মাটির নিচে চাপা পড়া সেই শিবায়ন পুথি যেন কালের ধুলো ঝেড়ে বলতে চায়—'আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব।'

- **কৃষকের খাতার অক্ষর-চিহ্নে এক সামন্তযুগের প্রতিচ্ছবি:**

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের সূক্ষ্ম চিহ্নগুলো মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকে একমুঠো পুরনো কাগজের টুকরোয়, যেখানে হাতের লেখার ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকে সময়ের নিঃশব্দ সাক্ষ্য। ১৮৮৩ বঙ্গাব্দের কিছু হিসাবের কাগজপত্র সেই নীরব ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়। সেই কাগজের টুকরোয় স্পষ্ট সুঠাম হস্তাক্ষরে লেখা ছিল- 'শন ১২৮৩ তিরাসি সাল তারিখ ১২ চৈত্র খাটানি আরম্ভ শ্রীনারায়ণ মণ্ডল সাং সুলতানপুর।'এক নিঃশব্দ অথচ

দৃঢ় অক্ষরে লেখা এই বাক্য শুধুমাত্র একটি সময়ের কৃষিকাজের সূচনার কথা জানায় না; এর পেছনে লুকিয়ে থাকে ঋণ, দাদন, খাটানি, এবং গ্রামীণ অর্থনীতির জটিল বুনন।

এই খাতায় নারায়ণ মণ্ডল নামক কৃষকের নামোল্লেখের পাশাপাশি পাওনা ফসলের পরিবর্তে তাকে অগ্রিম ৯ টাকা দাদন দেওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ রয়েছে। এটি শুধু একটি আর্থিক লেনদেন নয়, বরং ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি, যেখানে কৃষকরা ছিল ঋণের বেড়াজালে বন্দী। সেই ঋণের অঙ্ক ছোট হলেও তার শিকড় ছিল গভীর, যা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পরম্পরায় গড়িয়ে যেত। মার্কস তাঁর *Das Kapital*- এ 'Primitive Accumulation' বা 'প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়'- এর যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তার প্রয়োগ আমরা নারায়ণ মণ্ডলের এই দাদনের হিসাবেও দেখতে পাই। ঋণের বিনিময়ে ফসল, খাটানি এবং প্রায়শই শ্রমের উপর মালিকানা স্থির হতো। একদিকে জমিদারের অগ্রিম অর্থ প্রদান, অন্যদিকে ফসলের মাধ্যমে সেই ঋণ উসুলের জটিল হিসাব- এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই নির্মাণ করত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শক্তিশালী ভিত্তি।

পৃথক একটি কাগজে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই বছরেরই ১৮ চৈত্র, গরু কেনার জন্য ২০ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এখানে নামোল্লেখ নেই, তবে হাতের লেখা ছিল এক, যা স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সেই সমস্ত খরচের হিসাব রাখতেন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, প্রতিটি লিপিবদ্ধ লেখার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একজন জমিদার বা সম্পন্ন কৃষকের সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা। হিসাবের ধারাবাহিকতা, তারিখের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ এবং খরচের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধকরণ- সবই ছিল নিখুঁত ও পরিশীলিত। এই পরিশীলিত হস্তাক্ষর এবং যথাযথ হিসাবরক্ষণ থেকে তার আর্থসামাজিক অবস্থান সহজেই অনুমেয়।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে- সময়ের অধিকাংশ কৃষক ছিল নিরক্ষর। তাদের পক্ষে এই রকম সুশৃঙ্খল হিসাবরক্ষণ তো দূরের কথা, স্বাক্ষর করাও ছিল এক দূরুহ বিষয়। নারায়ণ মণ্ডলের ক্ষেত্রে সেই চিত্র পরিষ্কার, যিনি দাদনের অর্থ গ্রহণ করলেও নিজে কিছু লিখতে সক্ষম ছিলেন না। অপরদিকে, যিনি এই খাতাগুলো লিখে রেখেছেন, তিনি শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নই নন, বরং পরিশীলিত ও সুগঠিত হস্তাক্ষরের অধিকারী। এই সুস্পষ্ট ও সুঠাম হস্তাক্ষর ইঙ্গিত দেয় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে। এখানে এটা বলা যায় না যে, শুধুমাত্র পেশাদার লিপিকররাই সুন্দর হস্তাক্ষরে পারদর্শী ছিলেন। জমিদার বা সম্পন্ন কৃষকেরাও ছিলেন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুসংহত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও এই ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্র'- এ চাণক্য উল্লেখ করেছেন, 'ধন আদান-প্রদানের হিসাব রাখার জন্য প্রতিটি লেনদেন লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে, যাতে পরবর্তী কালে কোনো বিরোধ না তৈরি হয়।' (অর্থশাস্ত্র, তৃতীয় অধ্যায়)। মধ্যযুগের ইউরোপেও সামন্তপ্রভুদের অধীনে খাতায় জমির মালিকানা ও ফসলের হিসাব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ থাকত। ইংরেজ সামন্ত প্রথায় এটি পরিচিত ছিল 'Manorial Rolls' নামে।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, হস্তাক্ষর শুধু লেখার মাধ্যম নয়, বরং তা এক সামাজিক পরিচয়ের চিহ্নও বটে। একটি খাতার অক্ষরে লুকিয়ে থাকে সেই সময়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান এবং প্রজাপতির মতো ক্ষুদ্র অথচ সুদৃঢ় এক জীবনের নিঃশব্দ স্পন্দন।

এই আলোচনায় নারায়ণ মণ্ডলের খাতার টুকরোগুলো যেন কালের বুকে খোদাই করা এক নীরব প্রমাণ, যা সময়ের প্রবাহে বিলীন হলেও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অমলিন থেকে যায়। অক্ষরের ভাঁজে ভাঁজে লেখা থাকে এক অন্যায়ের ইতিহাস, এক অসম প্রতিযোগিতার গল্প, যা শুধু আর্থিক লেনদেনের দলিল নয়; তা এক প্রজন্মের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার অনবদ্য সাক্ষ্য।

- **শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মন্দিরফলকের লিপি: ঐতিহাসিক ভাষ্য ও শিল্পিত প্রতিচ্ছবি:**

প্রাচীন বাংলার লিপি- ঐতিহ্য শুধু পুথির হস্তাক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর এক বিস্তৃত ধারাবাহিকতা মূর্ত হয় শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং মন্দিরফলকের খোদিত লিপিতে। এদেরকে প্রচলিত অর্থে 'হস্তাক্ষর' না বলা গেলেও, এই লিপিগুলি এক অর্থে হস্তাক্ষরের আদলেই নির্মিত, শিল্পীর নিপুণ খোদাইয়ের মাধ্যমে পাথর বা ধাতব তলে ভাষার চিরন্তন প্রতিচ্ছবি স্থাপিত হয়েছে। খোদিত এই অক্ষরসমূহ ছিল শাসন- প্রশাসনের দলিল, দানপত্র, রাজকীয়

ঘোষণাপত্র এবং মন্দিরের ধর্মীয় নির্দেশাবলীর সাক্ষ্যবাহী। এই শিলালিপি ও তাম্রশাসনের ভাষা, লিপি, শৈল্পিকতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের ইতিহাসের মূল্যবান নিদর্শন।

- **শিলালিপি ও তাম্রশাসন: শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিফলন:**

বাংলার শাসনব্যবস্থায় শিলালিপি ও তাম্রশাসনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই লিপিগুলি শুধু রাজকীয় দানপত্র বা প্রশাসনিক আদেশ নয়; বরং সামাজিক স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির এক লিখিত দলিল। লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৬) মাধাইনগর তাম্রশাসন ও ভাওয়াল তাম্রশাসনের দিকে তাকালে এর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। খোদিত অক্ষরের শৈল্পিকতা, ভাষার পরিশীলিত ব্যবহার এবং রাজকীয় সিলমোহরের নিখুঁত প্রকাশ সেই সময়কার প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচায়ক। শাসকের দান, অধিকার অর্পণ কিংবা ভূমি প্রদান- এসবের আইনি বৈধতা প্রমাণে এই খোদিত লিপির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। শিল্পীর হাতে খোদিত সেই অক্ষরসমূহ শুধু তথ্যের বাহক নয়, ইতিহাসের শৈল্পিক উপস্থাপনাও বটে।

আবার, ত্রিপুরার একটি তাম্রশাসনের প্রসঙ্গ ধরা যাক। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্যের আত্মীয়া পুণ্যবতী দেবী জনৈক আচার্য বনমালীকে কুমিল্লার কয়েকটি গ্রাম দান করেন। এই তাম্রশাসনের ভাষা ছিল সংস্কৃত, কিন্তু লিপি ছিল বাংলা। লক্ষণীয়, এখানে খোদিত অক্ষরের শৈল্পিকতা ছিল অপরিশীলিত ও অপরিণত, যা মূলধারার রাজকীয় শাসনপ্রণালীর তুলনায় স্বতন্ত্র। শিল্পীর হাতের পরিপক্বতার অভাব স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছিল সেই লিপির বিন্যাসে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজকীয় ক্ষমতার উচ্চস্তরের দানপত্রে লিপির সৌন্দর্য যেমন সুবিন্যস্ত, নিম্নস্তরের ব্যক্তিগত বা ছোট দানে তেমনটা ছিল না। এই বৈষম্যই আমাদের সামনে তুলে ধরে সেই সময়কার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ভেদরেখা।

- **লিপির শৈল্পিক উৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য**

শিলালিপি ও তাম্রশাসনের লিপির ক্ষেত্রে কেবল তথ্য সংরক্ষণই মুখ্য ছিল না, শিল্পীত সুষমা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও লক্ষণীয়। লিপিগুলি পাথর, তাম্র বা মন্দিরের ফলকে খোদিত হতো, এবং সেগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকত প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এটি ছিল একধরনের 'অক্ষর স্থাপত্য'- যেখানে ভাষা ও শিল্প একসূত্রে গাঁথা। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে অশোকের শিলালিপিগুলি নেওয়া যেতে পারে, যেখানে খোদিত লিপি শুধু শাসনপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করেনি, বরং তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক বার্তাও পরিবেশন করেছে। এই শৈল্পিক উৎকর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিপির কথা, যা কেবলমাত্র ভাষার বাহক ছিল না, বরং ইতিহাসের চিত্ররূপময় প্রতিফলনও ছিল।

- **পূর্ব-পশ্চিমের লিপি শৈলী:**

প্রাচ্যের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের খোদিত শৈল্পিকতা যেমন বাংলা ও সংস্কৃত লিপির মধ্যে সুসংগঠিত ও শিল্পীত ছিল, তেমনি পশ্চিমে গ্রিক ও রোমান শিলালিপিতে খোদিত অক্ষরেও শৈল্পিকতার ছাপ ছিল প্রকট। গ্রিকদের মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ লিপি যেমন তাদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারার পরিচায়ক, রোমান সাম্রাজ্যের খোদিত লিপি তেমনই সামরিক বিজয় ও আইন প্রণয়নের নিদর্শন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই লিপি শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সামনে এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ধারার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, যেখানে ভাষা ও শিল্প একসূত্রে গ্রথিত।

- **লিপি-ঐতিহ্যের চিরন্তনতা:**

শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মন্দিরফলকের খোদিত লিপি শুধুমাত্র ইতিহাসের দলিল নয়, বরং তা একটি জীবন্ত সংস্কৃতি, যা ভাষার শৈল্পিক রূপান্তরকে অমরত্ব দান করে। এর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শৈল্পিক ভাষা-প্রকাশের ঐতিহ্য আজও আমাদেরকে ইতিহাসের অনন্য এক ভাষ্যমালা উপহার দিয়ে যায়, যা কালের আবরণেও ম্লান হয় না।

- **প্রতিষ্ঠালিপির নীরব সাক্ষ্য: ঐতিহ্যের খোদিত স্মৃতি:**

বাংলা ভূখণ্ডের অগণিত মন্দিরফলক, যা ইতিহাসের পাতায় নীরব অথচ সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ঐতিহ্যের স্রোতকে অনুভব করা যায়। এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলি কেবল পাথরে খোদিত কিছু শব্দমালা নয়; বরং একেকটি ফলক যেন যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিচিহ্ন, যা আমাদের অতীতের মন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্থাপত্যরীতি এবং খোদাইকলার উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

প্রাচীন বাংলায়, বিশেষত মধ্যযুগে, মন্দির নির্মাণকালে প্রতিষ্ঠালিপি খোদাই করার রীতি ছিল অত্যন্ত প্রচলিত। শুরুর দিকে কালো পাথরের কঠিন স্তরে প্রতিষ্ঠাকাল, নির্মাণকার্য এবং দেবতার নাম খোদাই করা হত। এই খোদিত লিপি ছিল স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাকৃতিক প্রভাবে টিকে থাকার মতো শক্তিশালী। সময়ের পরিক্রমায় টেরাকোটার ফলকে খোদাই করার প্রবণতা দেখা যায়, যা শিল্পরীতির এক নতুন ধারা এনে দেয়। টেরাকোটার মৃন্ময় স্পর্শে মন্দিরের গাত্রপ্রাচীরে লিপিবদ্ধ হতো প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। আর তারও পরবর্তী সময়ে মার্বেলফলকে খোদাইয়ের চল শুরু হয়। মার্বেলফলকগুলি অধিকতর মসৃণ ও স্থায়িত্বশীল ছিল, যেখানে অক্ষরগুলির নকশা ছিল সুস্পষ্ট এবং ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত। এই ধারা মূলত ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে আধুনিকতার ছোঁয়া পায়।

প্রতিষ্ঠালিপির খোদাইশিল্প এক অভিনব দক্ষতার পরিচায়ক। যদিও লিপিটি হস্তাক্ষরে লিখিত নয়, তবুও খোদাইকরের হাতের ছোঁয়ায় অক্ষরগুলির নান্দনিকতা এবং ছাঁদের সৌন্দর্য অসাধারণভাবে ফুটে ওঠে। খোদাইকারী শিল্পীর নিপুণতা এবং সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে তার খোদিত অক্ষরের বিন্যাসে। এর মধ্য দিয়ে আমরা খোদাইশিল্পের কারিগরি দক্ষতা, স্থাপত্যশৈলী এবং ধর্মীয় আনুষঙ্গিকতার সার্থক সমন্বয় প্রত্যক্ষ করি।

একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠালিপি হলো চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরের ফলক। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক ফলকটি সংরক্ষিত রয়েছে চন্দ্রকোণা সংগ্রহশালায়। ফলকের লিপি অনুসারে, ১৫৭৭ শকাব্দ তথা **১৬৫৫** খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী লক্ষ্মণাবতী কর্তৃক এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। লালজীউ মন্দির, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত, একসময় ধর্মীয় এবং স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন ছিল। সেই প্রতিষ্ঠালিপির খোদিত বর্ণনায় নির্মাণকাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যা ইতিহাসের নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে।

ফলকটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো এর শেষ পঙক্তি- *"পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস।"* এই লিপির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তারাপদ সাঁতরা অনুমান করেন যে, মোহন চক্রবর্তী ছিলেন এই লিপির মূল রচয়িতা এবং গোকুল দাস ছিলেন এর খোদাইকারক। এই বিশ্লেষণ খোদাইশিল্পের দুই ধাপকে আলাদা করে চিহ্নিত করে- প্রথমত, ভাষার নির্মাণ, এবং দ্বিতীয়ত, ভাষার খোদাই।

মন্দিরফলকগুলির এই খোদিত অক্ষর শুধু প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে ধারণ করে না, বরং তা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও প্রতিফলিত করে। যেমনটি আমরা পাই দক্ষিণ ভারতের তাম্রলিপি কিংবা অজন্তা- ইলোরা গুহার শিলালিপিতে, যেখানে দেবদেবীর আরাধনা এবং রাজসভার কীর্তিগাথা খোদাই করা হয়েছিল। বাংলার মন্দিরফলকগুলিও ঠিক তেমনই, ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে ভাষার অক্ষরে বন্দী করে রেখে গেছে।

শিল্প, স্থাপত্য এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের এই একত্রিত প্রকাশ মন্দিরফলককে নিছক পাথরের খোদিত অক্ষরের গণ্ডিতে আটকে রাখে না; বরং তাকে করে তোলে এক জ্যান্ত ঐতিহ্য, যা শতাব্দী পেরিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতীতের স্মারক হয়ে বেঁচে থাকে। এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলি শুধু স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন নয়, বরং একেকটি ফলক একেকটি ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

"ইতিহাস কথা বলে, শুধু প্রয়োজন তার কান পেতে শোনা।"- এই নীরব সাক্ষ্যগুলিকে শ্রবণ করলেই অতীতের সেই গৌরবময় নির্মাণশৈলী ও ধর্মীয় ঐক্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরের ফলক তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এইভাবে বাংলার প্রাচীন মন্দিরফলকগুলি একদিকে ইতিহাসের সংরক্ষক, অন্যদিকে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক। পাথরের বুকে খোদিত সেই অক্ষরগুলো আজও নীরবে বলে চলে আমাদের অতীতের গল্প, যা আমাদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখে।

- **প্রস্তরফলকে খোদিত লিপির অন্তর্নিহিত পাঠ: শৈল্পিক অমরত্বের প্রতিচ্ছবি:**

খোদাই করা লিপিগুলি ছিল অমসৃণ, অসমতল- যেন অক্ষরের গঠনশৈলীতে এক অদ্ভুত এলোমেলো ভাব। প্রতিটি অক্ষর ছিল পৃথক, তাদের মধ্যে ছিল না সুবিন্যস্ত সামঞ্জস্য। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, খোদাইকার্যের পেছনে কোনো দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্মতা কাজ করেনি; বরং এক অপটু খোদাইকারীর আঙুলের ছোঁয়ায় অক্ষরগুলি পাথরের গায়ে অঙ্কিত হয়েছে। তবে, খোদিত বয়ানের সারবস্তু এখানে আলোচ্য নয়; শুধু একটিমাত্র পঙক্তি পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে- **"পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস।"**

তদন্তমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারাপদ সাঁতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মোহন চক্রবর্তী লিপিটির মূল রচয়িতা, আর খোদাইকার্যের দায়িত্বে ছিলেন গোকুল দাস। অর্থাৎ, মন্দিরের নির্মাতা এবং ফলকটির খোদাইকারক দুই ভিন্ন ব্যক্তি। এই দ্বৈত পরিচয় শুধু নির্মাণশৈলীর পৃথকতার ইঙ্গিতই দেয় না, বরং খোদাইকার্যের প্রথাগত প্রকরণের দিকেও ইঙ্গিত করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনকালে পাথর বা মৃত্তিকা-ফলকে কোনো লেখা খোদাই করার আগে, মূল লেখকের বয়ানকে একটি নিখুঁত রেখাচিত্রে গুটিয়ে তোলা হত। সেই অঙ্কিত রেখাচিত্র ছিল মূল লেখকের হস্তলিপির প্রতিফলন। পরে সেই রেখাচিত্রের ওপর ভিত্তি করেই খোদাইকার্য সম্পন্ন হত। ফলে, ফলকের গায়ে যে খোদাই লিপি ফুটে উঠত, তা মূল রচয়িতার হস্তলিপির এক প্রতিচ্ছবিমাত্র।

এই পদ্ধতির বৈচিত্র্যময়তাকে বুঝতে গেলে, প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও খোদাই শিল্পের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এলিফ্যান্টা গুহার শিলালিপি কিংবা খাজুরাহোর মন্দির প্রাঙ্গণের খোদিত শ্লোকগুলি এই খোদাই পদ্ধতির অপূর্ব নিদর্শন। প্রতিটি খোদাইয়ে খোদাইকারকের শৈল্পিক দক্ষতা যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি মূল লেখকের চিন্তাধারাও অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এখানে তারাপদ সাঁতরার অনুমান শুধু কল্পনার বিস্তার নয়, বরং ঐতিহাসিক খোদাই পদ্ধতির প্রামাণ্য স্বীকৃতি। খোদাইকারক এবং রচয়িতা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাজের মধ্যে যে সাংগীতিক সাযুজ্য রচিত হয়েছে, তা এক শিল্প- অভিজ্ঞান। যেমন, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কিউনিফর্ম লিপি বা প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক খোদাইকার্যেও আমরা দেখতে পাই, মূল লেখকের বাণীকে পাথরে অমর করে তোলার এই অনন্য দক্ষতা।

তাই, এই লিপির প্রতিটি অক্ষর কেবল ভাষার বাহক নয়, বরং এক যুগের প্রতিচ্ছবি- যেখানে খোদাইকারক আর রচয়িতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় গড়ে ওঠে এক অক্ষয় শিল্পকীর্তি। 'পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস' নামাঙ্কিত সেই ফলক শুধু ইতিহাসের এক পরিচায়ক নয়; বরং মানুষের সৃজনশীলতার এক শাশ্বত নিদর্শন।

- **শিবনিবাসের রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি: এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান:**

নদিয়ার শিবনিবাসে অবস্থিত রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি এক অনন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, যার শাসনকাল বাংলা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত। প্রতিষ্ঠালিপির ভাষা এবং খোদাইপ্রকল্পের নিপুণতা প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্প- ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিশেষ আলোচনার বিষয়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাবর্ষ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে ১৬৮৪ শকাব্দ, যা খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে ১৭৬২ সালের সমতুল্য।

প্রতিষ্ঠালিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো খোদাইকার্যের ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস ও শিল্পগুণ। যদিও খোদাইকারকের নাম লিপিতে উল্লিখিত নেই, তথাপি শিল্পশৈলীর নিখুঁত বিন্যাস ও স্পষ্টতর রূপায়ণ এই প্রতিষ্ঠালিপিকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। চন্দ্রকোণার ফলকের তুলনায়, যেখানে খোদাইয়ের কারুকার্য ছিল কিছুটা অপরিণত এবং 'কাঁচা,' সেখানে শিবনিবাসের এই লিপিতে দেখা যায় পরিপূর্ণ শিল্পবোধের প্রকাশ। লিপির অক্ষর বিন্যাসে রয়েছে এক অপূর্ব ভারসাম্য, যা কেবল দক্ষ শিল্পীর হাতেই সম্ভব।

- **নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপি: শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রতিচ্ছবি:**

প্রসঙ্গক্রমে, শেওড়াফুলির নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপি (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ) আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এই লিপি তার শিল্পগুণ ও সৌকর্যের দিক থেকে অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্ষর বিন্যাসের নিখুঁততা, খোদাইয়ের সূক্ষ্মতা এবং ভাষার সংযত ব্যবহারে এই লিপিটি বাংলা শিল্প- ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

লিপিতে ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত, যা তৎকালীন বঙ্গদেশের বহু মন্দির ও প্রতিষ্ঠালিপিতে দেখা যায়। এটি ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন। প্রসঙ্গত, বঙ্গদেশের বহু সংস্কৃত পুথিতেও এমন শিল্পগুণের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানেই শিবনিবাসের মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির সঙ্গে নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকের শিল্পগুণের একটি সূক্ষ্ম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। শিবনিবাসের লিপিতে খোদাইয়ের নিখুঁত সমতা থাকলেও, নিস্তারিণী কালীবাড়ির লিপি শৈল্পিক সৌকর্যে তাকে অতিক্রম করেছে।

- **ভাষার দ্বৈত ব্যবহার: ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও নতুনতর সংযোজন:**

এই তিনটি প্রতিষ্ঠালিপির মধ্যে ভাষার ব্যবহারে একটি সাধারণ ঐক্য বিদ্যমান। লিপিগুলির মূল ভাষা সংস্কৃত হলেও, নদিয়ার শিবনিবাসের মন্দির এবং নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকে বাংলার ছোঁয়া স্পষ্ট। বিশেষত, নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপির শেষ চারটি পঙক্তি বাংলায় উৎকীর্ণ, যা ভাষাগত মেলবন্ধনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে শেষ দু-পঙক্তি উল্লেখযোগ্য:

> *"মাটিয়ারি গ্রামবাসি নির্মানেতে দক্ষ।*
> *কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্কর নির্মিল সমক্ষ।"*

এখানে 'মাটিয়ারি গ্রামবাসি' শব্দবন্ধ বাংলা গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত বহন করে। আর কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্কর ছিলেন মন্দিরটির প্রধান স্থপতি। তবে, প্রশ্ন উঠে, এই উৎকীর্ণ লিপিটি কি কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্করেরই সৃষ্টি? প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট না হলেও, ধারণা করা যায় খোদাইকার্যের এই সূক্ষ্মতা এবং শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্ভবত ভিন্ন কোনো দক্ষ শিল্পীর হাতের কারুকার্য।

- **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পবোধের সমন্বয়:**

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভারতীয় খোদাই শিল্পে যেমন সূক্ষ্মতার প্রাধান্য, তেমনই পাশ্চাত্য গথিক স্থাপত্যশৈলীতেও এই সূক্ষ্মতার ছোঁয়া বিদ্যমান। বিশেষত, ইতালির পিসা ক্যাথেড্রালের খোদাইশিল্প কিংবা ফ্লোরেন্সের ক্যাথেড্রাল দুমোর কারুকার্য আমাদের নিস্তারিণী কালীবাড়ির লিপির শিল্পবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে যেমন প্রতিটি খোদাইয়ে শিল্পের শুদ্ধতা ফুটে ওঠে, নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকেও তেমনই এক শিল্পনৈপুণ্যের ঝলক দেখা যায়।

- **ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক মননের সংযোগ:**

শিবনিবাসের রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দির, নিস্তারিণী কালীবাড়ি এবং চন্দ্রকোণার ফলকের এই তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাংলার মন্দির স্থাপত্যে খোদাইকার্যের সূক্ষ্মতা কেবল শিল্পভাবনাই নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রমাণও। এই স্থাপত্যগুলোতে খোদাইয়ের ভাষা যেমন সংস্কৃত ও বাংলা—তেমনি খোদাইয়ের শিল্পগুণেও রয়েছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, 'সংস্কৃতি মানে শুধু অতীতের উত্তরাধিকার নয়, তা বর্তমানের নির্মাণও।' এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলির খোদাইশিল্প সেই নির্মাণের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে অতীতের ঐতিহ্য আর বর্তমানের শিল্পনৈপুণ্য একাকার হয়ে উঠে।

এভাবে শিল্প, সংস্কৃতি, এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই লিপিগুলি আমাদের কাছে শুধু পাথরে খোদিত কিছু অক্ষর নয়, বরং অতীতের এক জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেছে।

- **পুথির হস্তলিপি: সৃষ্টির রূপরেখা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব:**

পুথির জগতে প্রবেশ করলে প্রথমেই আমাদের নজরে আসে হস্তলিপির নান্দনিক বৈচিত্র্য। এটি শুধু কাব্য বা গদ্যের বাহ্যিক রূপ নয়, বরং এক গভীর ঐতিহ্যের স্মারক। কালের প্রবাহে, লিপিকরদের সুক্ষ্ম হাতে রচিত এই পুথিসমূহে কখনো কখনো বানান-ভুল, শব্দের স্থানচ্যুতি বা বাক্যপ্রক্ষেপণ দেখা যেত, যা মূল সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকত না। এই ত্রুটিগুলি, যা কখনো অসাবধানতায়, কখনো অজ্ঞতায় বা কখনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুক্ত হত, তা পুথির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করত।

লিপিকরদের নিজস্ব সাফাই ছিল একেবারেই স্পষ্ট। পুথির শেষাংশে, অর্থাৎ পুষ্পিকায় তারা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করতেন- *'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক দোষ নাস্তি'* অর্থাৎ, 'যা দেখেছি, তাই লিখেছি; লেখকের (লিপিকরের) কোনো ত্রুটি নেই।' এই সরল স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁরা যেন সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলতেন। আবার কখনো কখনো তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে বলতেন, *'ভীমাস্বপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম '* যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম পতিত হলেও মুনিদের চিন্তার ভ্রান্তি হতে পারে। এই কথাগুলি শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন নয়, বরং তৎকালীন কপিলংকিত সমাজের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রতিফলিত করে, যেখানে ভুল স্বীকার না করেও দায় এড়ানোর প্রবণতা লক্ষণীয়।

জনৈক লিপিকর ফকির চান্দ সেন আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, *'এই পুস্তক দেখিয়া যেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চত্র।'* এই ঘোষণা ছিল একেবারে নির্ভীক এবং ঋজু। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে, যদি কেউ এই পুথির সমালোচনা করে, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এখানে লিপিকরের আত্মবিশ্বাস এবং নিজের কাজের প্রতি অগাধ আস্থার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে প্রশ্ন আসে, এই ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, পুথির পাঠ কি সম্ভব ছিল? ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, অধিকাংশ পুথির মালিক, অর্থাৎ যাঁরা এই পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করতেন, তাঁরা মূল পাঠাংশ প্রায়শই মুখস্থ রাখতেন। ফলে, হস্তলিপির জটিলতা তাঁদের কাছে তেমন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত না। পাঠ করতে গিয়ে কোনো অক্ষরের অস্পষ্টতা বা শব্দের বিভ্রান্তি হলে তাঁরা স্মৃতির আশ্রয়ে মূল পাঠটি উদ্ধার করতে পারতেন।

অন্যদিকে, লিপিকরদের মধ্যে অনেকেই পুথি নকল করাকে ধর্মীয় পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই বিশ্বাস তাঁদের হাতের লেখাকে যথাসম্ভব সুন্দর এবং স্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রেরণা জোগাত। হস্তলিপির মধ্যে যে শিল্পীত নিপুণতা দেখা যায়, তা এই ধর্মীয় অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। মনে পড়ে ইউরোপীয় মধ্যযুগের *Illuminated Manuscripts*- এর কথা, যেখানে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি হাতে লেখা হত এবং শিল্পিত অলঙ্করণে তা সুসজ্জিত করা হত। তেমনি বাংলার পুথিতেও সেই পরম্পরা বজায় ছিল।

এরপর আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলা হরফে মুদ্রণের প্রচলন শুরু হয়, তখন অক্ষরের ছাঁচ তৈরির জন্য যে হস্তলিপিগুলি ব্যবহার করা হত, তার ভিত্তি ছিল এইসব প্রাচীন পুথির লেখনী। বলা যায়, সেই সমস্ত লিপিকরদের হাতের রেখা থেকেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়।

ইতিহাসের এই বাঁকে এসে আমরা দেখতে পাই, পুথির হস্তলিপি কেবলমাত্র লেখার বাহ্যিক রূপ নয়, এটি ছিল বাংলা ভাষার বিকাশের মূল স্তম্ভ। প্রাচীন লিপিকরদের নিখুঁত সৃষ্টিশীলতা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই আজকের বাংলা ভাষার অক্ষররূপ নির্মিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ এবং পাশ্চাত্যের *Scriptorium* সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রেই হস্তলিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

তবে শুধু পুথির লেখনী নয়, এর মধ্যে যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নিহিত ছিল, তা এক বিশাল কালানুক্রমিক ইতিহাসের ধারক। সেই ইতিহাসের পাতায় লিপিকরদের হাতের টানে ফুটে ওঠা প্রতিটি শব্দ আজও স্মৃতির ক্যানভাসে অমলিন হয়ে রয়ে গেছে।

- **অক্ষরের উত্তরাধিকার: হস্তাক্ষর থেকে মুদ্রণযুগে বাংলা লিপির রূপান্তর:**

মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত, লিখনপ্রক্রিয়ার বিবর্তন মানুষের বৌদ্ধিক অভিযাত্রার এক অন্তর্লীন প্রতিফলন। লিখনের সেই প্রাথমিক ধারা ছিল হস্তাক্ষরনির্ভর- যেখানে প্রতিটি অক্ষর ছিল স্রষ্টার একান্ত মননের পরিচায়ক। তবে বাস্তবিক অর্থে, হস্তাক্ষর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন লিপিকরের স্বতন্ত্র প্রবণতা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বা সৃজনশীলতার গভীরতর মেধা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। এখানে বানানের গঠন, অক্ষরের শৈলী কিংবা ছাঁদ সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত হয়েছে, যা মূলত যৌথ প্রবণতারই ইঙ্গিত বহন করে। এই যৌথ প্রবণতার রূপান্তর কোনো একক লিপিকরের নয়, বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অভিযোজনের অংশ।

তবে এই বিবর্তনের ইতিহাস সহজ ও সরল ছিল না। লিপির আদিরূপ যখন তালপাতা বা ভোজপাতার উপর আঁকা হতো, তখন হস্তাক্ষরের গঠনশৈলী ছিল সম্পূর্ণরূপে লেখকের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। সেই দক্ষতা আবার নির্ধারিত হতো লেখার মাধ্যম, ব্যবহৃত কালি, লিপিকরের শারীরিক অবস্থা এবং তার একাগ্রতার মাধ্যমে। প্রাচীন

ভারতীয় শাস্ত্রে 'প্রিষ্ঠ ভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য প্রষ্ঠ অধোমুখং' বলে উল্লেখ রয়েছে- যেখানে লিপিকরের শারীরিক ভঙ্গি এবং লেখার সময় তার মনোসংযোগ কীভাবে লেখার শৈলীতে প্রভাব ফেলে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবার, এই পরিবর্তনশীলতার প্রভাব শুধু লিপির ছাঁদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; ধীরে ধীরে তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের প্রতিফলন হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। হস্তাক্ষরের এই রূপান্তর ছিল ধীর এবং কালস্রোতে গ্রথিত। বাংলা ভাষার প্রাচীন পুঁথিপাঠ থেকে শুরু করে মুদ্রণযুগের সূচনা পর্যন্ত, লিপির গঠনে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা মূলত যুগের প্রয়োজন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফল।

পুঁথির হস্তাক্ষর শুধু বাংলা সাহিত্যের লিখিত ঐতিহ্যের সাক্ষ্যই বহন করেনি, এটি ছিল এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক সংস্কৃতির ধারক। প্রতিটি অক্ষরের বাঁক, প্রতিটি শব্দের গঠন ছিল প্রায় শিল্পকর্মের সমতুল্য। যেমনটি ফিলিপ হোমার বলেছিলেন, *"Writing is not just a means of communication; it is an art that mirrors the soul of its creator."* সেই প্রতিফলনের মাধ্যমেই প্রাচীন বাংলার হস্তাক্ষর একদিকে শিল্প এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তবে কালক্রমে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে হস্তাক্ষরনির্ভর পাণ্ডুলিপির স্থান দখল করে নেয় মুদ্রণপ্রযুক্তি। প্রথমদিকে মুদ্রিত অক্ষরও ছিল হস্তাক্ষরের আদলে নির্মিত। সেই আদলকে 'আদর্শ' ধরা হতো, যা মূলত প্রাচীন হস্তলিপির অনুকরণেই সৃষ্টি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি লিপির ইতিহাস। মুদ্রণযুগের প্রচলন ভাষার রূপকে স্থিরতা দিলেও হস্তাক্ষরের নান্দনিকতাকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও স্বহস্তে লিখিত একটি পত্র বা পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে গভীর অনুভূতির প্রতীক হিসেবে ধরা দেয়।

এই উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করা শুধু সাংস্কৃতিক গর্ব নয়, এটি বাংলাভাষার প্রতি আমাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা। প্রখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'অক্ষরবৃত্ত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, *"অক্ষরকে আমরা যত্ন করে লালন করব, কারণ এতে লুকিয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতির গভীর স্মৃতি।"* আমাদের বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজেও সেই দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়- যেন বাংলাভাষার সেই ঐতিহ্যবাহী লিপিচর্চা এবং সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ন থাকে।

অতএব, হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য এবং তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের গুরুত্বকে আমাদের মনে রাখতে হবে। মুদ্রণযুগ আমাদের কাছে সহজলভ্যতা এবং স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দিলেও, হস্তলিপির নান্দনিকতা এবং মানবিকতার ছোঁয়া আমাদের হৃদয়ে আজও অম্লান। বাংলাভাষার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা, চর্চা করা এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্ব।

- **উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতার সেতুবন্ধন:**

যেমনটি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বলেছিলেন, *"A man paints with his brains and not with his hands."*- একজন লিপিকরও লেখেন তাঁর চিন্তা ও সংস্কারকে লিপিবদ্ধ করার মানসে। এই উত্তরাধিকারের সেতুবন্ধন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সজীব রাখতে হবে। মুদ্রিত অক্ষর আমাদের আধুনিকতার প্রতীক হলেও, হস্তাক্ষরের ঐতিহ্য আমাদের অতীতের স্মৃতি। এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব।

উপসংহার:

প্রাগাধুনিক বঙ্গীয় হস্তলিপি বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি জীবন্ত স্মারক। লিপিকরদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি এই পাণ্ডুলিপিগুলি শুধু ভাষার বাহকই নয়, এটি ছিল এক অমলিন শিল্পচর্চা। মুদ্রণযুগের আবির্ভাব এই হস্তলিপির প্রভাবকে কমিয়ে দিলেও, এর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব আজও অম্লান। লিপির প্রতিটি আঁচড়ে ছিল একেকটি গল্প, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত হয়েছে। তাই, এই অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ আমাদের দায়বদ্ধতা। আজকের ডিজিটাল যুগে, সেই প্রাচীন হস্তলিপির শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আমরা যেন ভুলে না যাই। আমাদের প্রজন্মের কাছে এই মূল্যবোধকে পৌঁছে দেওয়া, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, আনন্দ চন্দ্র, *Bengali Manuscript Tradition and Its Historical Significance*. কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রেস, ১৯৯৮
২. চৌধুরী, হরপ্রসাদ, *The Art of Bengali Calligraphy*. ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫
৩. ব্যানার্জি, সত্যজিৎ, *Script and Scribes of Ancient Bengal*. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১২
৪. সেন, দিনেশ চন্দ্র, *History of Bengali Literature*. কলকাতা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৮
৫. শর্মা,রমেশ, *The Evolution of Indian Manuscripts*. দিল্লি: একাডেমিক পাবলিশার্স, ২০১০
৬. ভট্টাচার্য, তন্ময়, *গঙ্গা- তীরবর্তী জনপদ*। মাস্তুল, ২০২৩
৭. বসু, ত্রিপুরা, *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা*। পুস্তক বিপণি, ২০০০
৮. ভৌমিক, যূথিকা বসু, *বাংলা পুথির পুষ্পিকা*। সুবর্ণরেখা
৯. সাঁতরা, তারাপদ, *মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র*। টেরাকোটা সংস্করণ, ২০১৫
১০. হালদার, কল্পনা, *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*। সাহিত্যলোক, ১৯৯৮

প্রতিষ্ঠান:

এশিয়াটিক সোসাইটি।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
বিশ্বভারতী।
চন্দ্রকোণা সংগ্রহশালা।

লেখকগণ:

তন্ময় ভট্টাচার্য,চক্রবর্তী, আত্রেয়ী, অরিন্দম গোস্বামী এবং সুবর্ণকান্তি উত্থাসনী।